দিন কাটে খুবই কষ্টে তবু বেঙ্গালুরুতে থাকা কিছু বাঙালি শ্রমিক এখনও গ্রামে ফিরে আসতে নারাজ

পরিযায়ী শ্রমিকদের দুর্দশার ইতি দেখা যাচ্ছে কি

বেঙ্গালুরুর উত্তরে হেব্বাল। সেখানেই এক টুকরো পশ্চিমবঙ্গ। থাকেন আবর্জনা কুড়নো বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকের দল। কেমন তাঁদের জীবন যাপন। লিখছেন

মোনালিসা চক্রবর্তী ও সুব্রত মুখোপাধ্যায়

তথ্য-প্রযুক্তির শহর বেঙ্গালুরু। তবে এ শহরে যে কেবলমাত্র তথ্য-প্রযুক্তি শিল্পকে কেন্দ্র করেই বিভিন্ন প্রদেশের দক্ষ শ্রমিকরা সেখানে পাড়ি দেন তা নয়। প্রযুক্তিনির্ভর এই শহরে এক শ্রেণির শ্রমিকের জীবনযুদ্ধ শুধুমাত্র শহরের উচ্ছিষ্টকেন্দ্রিক। জীবন ও জীবিকার সন্ধানে প্রতি বছরই বহু পরিযায়ী শ্রমিকের আনাগোনা দেখা যায় এ শহরে, যাদের জীবিকা নির্বাহ শুধুমাত্র শহরের নিক্ষেপিত আবর্জনা থেকেই হয়ে থাকে।

বেঙ্গালুরু শহরের উত্তরদিকের অঞ্চল হল হেব্বাল। সেখানে যাতায়াত করার সময় বহুতল আবাসনগুলির ফাঁকফোকরে উঁকি মারলেই দেখা যায় সারি সারি ঝুপড়ি ঘর ও তার চারিদিকে আবর্জনার স্তূপ। সেখানেই বাস বাংলা থেকে আসা একশ্রেণির পরিযায়ী শ্রমিকদের। আবর্জনা সংগ্রহ করে, সেই আবর্জনাকে ঠিকাদারের কাছে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে তারা। বৃহৎ বেঙ্গালুরু মহানগর পালিকার হিসেব অনুযায়ী বেঙ্গালুরু শহরে প্রতিদিন প্রায় ৫৭৫৭ টন আবর্জনা তৈরি হয় এবং তার মাত্র ৬৮ শতাংশ পৌরসভা দ্বারা সংগৃহীত হয়। অবশিষ্ট আবর্জনাই হয়ে উঠেছে এই পরিযায়ী শ্রমিকদের জীবিকা নির্বাহের উৎস। কেউ এখানে সদ্য এসেছে কাজের সন্ধানে, আবার কেউ রয়েছে প্রায় দশ বছরেরও বেশি। নদিয়াথেকে তিন বছর আগে বেঙ্গালুরুতে আসা বছর তিরিশের যুবক শফিকুলের (সমস্ত নামই গোপনীয়তা রক্ষার জন্য পরিবর্তিত করা হয়েছে) কথায়, 'আগে দেশে মাঠে লেবারের কাজ করতাম। সেখানে দিনে ১৫০ থেকে ২০০ টাকা রোজগার হত। ওই টাকা ছয়জনের পরিবার চালানোর জন্য যথেষ্ট ছিল না। তাছাড়া কাজ পাওয়ার কোনও নিশ্চয়তা ছিল না। গ্রামেরই একজনের থেকে এই কাজের ব্যাপারে জানতে পারি এবং তার সাথেই আমি বেঙ্গালুরুতে আসি। এ কাজ আমার পছন্দ নয়। দিনের শেষে ২৫০ থেকে ৫০০ টাকা পাই। বাড়িতে টাকা পাঠাতে পারি।'

দেনার দায়েও গ্রাম থেকে এসে আবর্জনা সংগ্রহের কাজে যুক্ত হয়েছেন বহু মানুষ। নদিয়া থেকে আসা মধ্য পঞ্চাশের কালিপদ বিশ্বাস দীর্ঘ ন'বছর ধরে আবর্জনা সংগ্রহকারীদের ঠিকাদার হিসেবে আছেন বেঙ্গালুরুতে। হেব্বালে মাসিক তিরিশ হাজার টাকায় জমি ভাড়া নিয়ে, সেখানে ঝুপড়ি বানিয়ে তার অধীনে থাকা পঁয়ত্রিশ জন শ্রমিকের থাকার ব্যবস্থা করেছেন। টিন, প্লাস্টিক এবং ফেলে দেওয়া নানা জিনিস দিয়ে তৈরি হয়েছে কিছু ঝুপড়ি। নিজেও থাকেন সেখানেই।

একেকজন ঠিকাদারের অধীনে থাকে কুড়ি থেকে তিরিশ জন শ্রমিক। সারা শহর ঘুরে তাদের সংগ্রহ করে আনা লোকজনের ফেলে বা বাতিল করে দেওয়া বিভিন্ন জিনিসপত্রের ওজন ও দাম দেখেই ঠিকাদার তাদের টাকা দেন। ঠিকাদাররা আবর্জনাগুলিকে আলাদা আলাদাকরে বিভিন্ন দামে বিক্রি করেন ব্যাপারীর কাছে। এই সব জিনিসের দাম দিনে দিনে কমে আসছে, জানান আবর্জনা সংগ্রহকারীদেরই একজন, আসরাজুল। ব্যাপারীরা আজকাল ঠিকমত দাম দিতে চায় না। আগে যেখানে পিচবোর্ড ৬ থেকে ৭ টাকা প্রতি কেজি বিক্রি হত, তা এখন ৪ থেকে ৫ টাকার বেশি দামই ওঠে না।

সব ছেড়ে জঞ্জাল কুড়ানো কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে আসরাজুল জানালেন যে 'আবর্জনা কুড়িয়ে আয় বেশ ভালই হয়। তবে সারাদিন আবর্জনার স্তূপে কাজ করতে হয়। সব সময় উটকো একটা গন্ধ। প্রথম প্রথম কাজ করতে খুব অসুবিধা হত। দু-একবার তো ভেবেছিলাম কাজই ছেড়ে দেব। কিন্তু কাজ ছেড়ে যাবই বা কোথায়। সংসার তো চালাতে হবে!' এ রকম ভাবেই অনেকে থেকে গেছেন এখানে। দিনে ৫০০ থেকে ৭০০ টাকা পর্যন্ত আয় হয়। তবে তারা রোজ কাজ করতে পারেন না। একটানা দু-তিন দিন কাজ করলেই সারা শরীরে যন্ত্রণা হয়। এত সব জঞ্জাল বেঙ্গালুরুর উঁচু নিচু রাস্তা দিয়ে সারাদিন টেনে নিয়ে যাওয়া কম কষ্টকর নয়! তবে এই কাজে একটা সুবিধা হল, পরিবারকে নিয়ে থাকা যায়। তাদের স্ত্রীরা আশেপাশের আবাসনে পরিচারিকার কাজ করার সুযোগ পায়। এতে পরিবারের আয় প্রায় দেড় থেকে দ্বিগুণ হয়ে যায়।

মুর্শিদাবাদ থেকে আসা বছর তিরিশের আজনারুলের কথায়, 'আমাদের জীবন নিত্য- নতুন ঝুঁকিতে ভরা। জঞ্জাল সংগ্রহের সময় প্রায়ই পুলিশের হয়রানির সম্মুখীন হতে হয়। কোথাও চুরির ঘটনা ঘটলে অনেক সময় আমাদের দায়ী করা হয়। তবে এখন প্রায় সব জায়গাতেই সিসিটিভি ক্যামেরা। তাই নিজেদের নির্দোষি প্রমাণ করতে অসুবিধা হয় না। পুলিশ মাঝে মধ্যে আমাদের এখানের গুদামেও আসে জিনিসপত্র দেখতে ও ঠিকাদারের কাছ থেকে টাকা নিতে।'

> একটানা দু-তিন দিন কাজ করলেই সারা শরীরে যন্ত্রণা হয়। এত সব জঞ্জাল বেঙ্গালুরুর উঁচু নিচু রাস্তা দিয়ে সারাদিন টেনে নিয়ে যাওয়া কম কষ্টকর নয়! তবে এই কাজে একটা সুবিধা হল, পরিবারকে নিয়ে থাকা যায়। তাদের স্ত্রীরা আশেপাশের আবাসনে পরিচারিকার কাজ করার সুযোগ পায়।

এদের সকলের মতে স্ত্রীদের পরিচারিকার কাজ করতে গিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না। এদের মধ্যে অনেকেই বেঙ্গালুরুতে আসার আগে দিল্লিতে জঞ্জাল কুড়ানোর কাজ করতেন। দিল্লিতে তাদের অভিজ্ঞতা ছিল ভিন্ন। 'দিল্লিতে হিন্দু-মুসলমান একটা ব্যাপার। মুসলমান মেয়েদের হিন্দু বাড়িতে কাজ পাওয়া কঠিন' বললেন নদিয়া থেকে আসা বছর বত্রিশের আমিনা। এছাড়া, দিল্লিতে বহু সমস্যা। ঝগড়া ও মারামারি প্রায় লেগেই থাকত। তাই বেঙ্গালুরুতে যখন কাজের সন্ধান পায়, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চলে আসে। বেঙ্গালুরুতে আয়ও তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশি।

তবে এখানেও জীবন অনেক রকম অনিশ্চয়তাতে ভরা। হেব্বালের জঞ্জাল সংগ্রহকারীদের একজন হলেন বছর চল্লিশের জ্ঞানেন্দ্র। তার কথায় 'জলের সমস্যা এখানে প্রধান। দিনে ওই একবার ট্যাংকার এসে জল দিয়ে যায়। তাই-ই স্নান ও অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা হয়। বাথরুমের ব্যবস্থা নেই। অনেক সময় মিউনিসিপালিটির লোক এসে বলে জায়গা খালি করে দিতে হবে।'' এখানে কিছুই স্থায়ী নয়। পেটের দায়ে আছি আর কী!' ঠিকাদার কালিপদর গলাতেও একই অনিশ্চয়তার সুর।

অনেকে পরিযায়ী শ্রমিকই এখানে এসেছেন বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়ে। কিছু বাচ্চা স্কুলে যায়, তবে বেশিরভাগই যায় না। মায়েরা জানালেন যে স্থানীয় বাচ্চাদের সঙ্গে তাদের বাচ্চাদের স্কুলে মারামারি হয়। সেই কারণেই তারা বাচ্চাদের স্কুলে পাঠায় না। মুর্শিদাবাদ থেকে আসা রাহানুমা জানালেন, এই একই সমস্যা তাদের দিল্লিতেও ছিল। সেখানেও বাচ্চাদের মধ্যে মারামারি হত। তবে বেঙ্গালুরুতে যে বাচ্চারা বেসরকারি স্কুলে পড়ে, তাদের স্কুলে ভর্তির অর্ধেক টাকা দেয় একটি এন জি ও, এবং বাকি টাকাটা তাদেরকে দিতে হয়। শুধু তাই নয়, এই সব স্কুলে বাচ্চাদের খাবারও দেওয়া হয়।

স্কুলে না যাওয়া এমন বাচ্চাও আছে যারা এই বয়সেই বেছে নিয়েছে আবর্জনা সংগ্রহকারীর কাজ। বারো বছর বয়সের আনোয়ার, মুর্শিদাবাদ থেকে এসে গত এক বছর ধরে হেব্বালে আছে তার মায়ের সঙ্গে। পড়াশুনা চুকে গেছে তার আরও কয়েকবছর আগেই। মা কাছেরই এক আবাসনে পরিচারিকার কাজ করেন আর আনোয়ার আবর্জনা সংগ্রহ করে। এভাবেই দিন কাটছে মা ও ছেলের।

এসব সত্ত্বেও বেঙ্গালুরু ছেড়ে ফিরতে চান না বেশিরভাগ শ্রমিক। যদিও নিজের রাজ্যে, নিজের গ্রামে মন পড়ে থাকে তাদের। আত্মীয়-পরিজন, বন্ধুবান্ধব সবই তো নিজের দেশে। কিন্তু পেটের দায়ে গ্রামে ফিরে যাওয়ার সাধ্য নেই তাদের। তাই বেঙ্গালুরুর হেব্বালেই নিজেদেরই একটা ছোট্ট গ্রাম তৈরি করে নিয়েছেন নিজেরা। বাংলার নানা জেলার পরিযায়ী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সম্মেলনে এ যেন এক ছোট্ট পশ্চিমবঙ্গ।

গত বছরের ঠিক মাঝামাঝি সময়ে করা এই ক্ষেত্রসমীক্ষার পর বেশ কয়েক মাস কেটে গেছে। করোনা মহামারী ও লকডাউনে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আটকে থাকা পরিযায়ী শ্রমিকদের নিত্য-নৈমিত্তিক দৈন্য-দুর্দশা, অনাহার ও মৃত্যুর কাহিনির যেন কোনও অন্ত দেখা যাচ্ছে না। এই লকডাউনের মধ্যে কেমন করে দিন কাটাচ্ছেন হেব্বালের সেই বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকরা? টেলিফোনে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও, সকলকে পাওয়া বেশ দুষ্কর। এই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও অনেকে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে রাজি হলেন আর জানালেন তাদের বর্তমান পরিস্থিতি ও মনের অবস্থা। সারা দেশে পরিযায়ী শ্রমিকদের নিজের রাজ্যে ফেরার যে ব্যাকুলতা দেখা যাচ্ছে, বেঙ্গালুরুর আবর্জনা সংগ্রহকারী পরিযায়ী শ্রমিকরা যেন তার ব্যতিক্রম। তারা কাজ ছাড়া আছেন প্রায় পঞ্চাশ দিনেরও বেশি। এই মুহূর্তে কোনও আয় নেই। অতীতের সঞ্চয়ের টাকা দিয়েই চালাতে হচ্ছে। লকডাউনের পর দুবার পুলিশ এসে কিছু চাল, ডাল, তেল, নুন দিয়ে গিয়েছিল। কিছুদিন আগে এনজিও ম্যাডামরা এসে কিছু রান্না করা খাবারও দিয়ে গেছেন। লকডাউনের প্রায় দুমাস আগেই নদিয়াথেকে বেঙ্গালুরুতে এসেছেন সরিফুল। বাড়ি গিয়েছিলেন এক মাসের জন্য। তার কথায় 'এখন আর যেতে চাই না গ্রামে। গেলেই তো সেই কোয়ারেনটিনে রেখে দেবে। সুস্থ শরীরকে অসুস্থ করব কেন বলুন? চিন্তা হয় বাড়ির লোকগুলোর জন্য। কিন্তু সবাই এখন নিরুপায়। আর এখান থেকে যদি সবাই চলে যাই, কাঁচড়ার মালপত্র দেখাশুনা করবে কে?'

কালবেলা

#করোনাভাইরাস

মোনালিসা চক্রবর্তী ইনস্টিটিউট অফ ডেভলপমেন্ট স্টাডিজ, কলকাতায় গবেষক
সুব্রত মুখোপাধ্যায় ইনস্টিটিউট অফ ডেভলপমেন্ট স্টাডিজ, কলকাতায় শিক্ষক